ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/005

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে বুদ্ধ ভাবাদর্শের প্রকাশ

ড. মিলটন কুমার দেব*

Abstract: Vivekananda (1863-1902), a major personality of 19th century Bengal, regarded as a cyclonic monk and pioneer thinker who went upto USA to preach universal humanism in the parliament of religion in 1893 at Chicago. He presented Buddha to western audience as shining example of Bengal's spiritual ideal. This article is about how Vivekananda considered Buddha as the perfect being. He said, As a character, Buddha is the greatest the world has ever seen. He had a vision of Lord Buddha when he was young. Following the Sangha (Association) formed by Buddha, Vivekananda founded the Ramakrishna Mission in 1897, which working immensely for the cause of the humanity without any discrimination between caste, creed, gender and religion. Vivekananda mentioned in many places that Buddha was his Ishta Devata. Vivekananda recalled that he (Buddha) was the only man who was ever ready to give up his life for animals to stop a sacrifice. It proves that Buddhism had a major influence on his life. So this paper analyzes how Vivekananda felt a deep emotional and kinship with Buddha.

মুখ্যশব্দঃ

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ-শিরোনামে ইতিহাসের রেনেসাঁ যে দুইজন মহামানবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁদের আবির্ভাব ছিল যুগের প্রয়োজনে, সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে। গৌতম বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের মধ্যে বাহ্যত কোনো মিল নেই, নামের আগে দুজনেরই আছে দুটি বিশেষ অভিধা– তথাগত ও স্বামী। গৌতম বুদ্ধের জন্ম বিবেকানন্দের বহুকাল আগে। ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধ ছিলেন পৃথিবীতে। তাঁর জন্ম হয় নেপালে। আর বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতায়। (অমৃতত্বানন্দ, ১৯৮১, পৃ. ২) শুধু ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক মানদণ্ডেও দুজনের অবস্থান দুই মেরুতে। বৈরাগ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অবস্থাসম্পন্ন রাজপরিবারের মানুষ, বিবাহিত এবং এক সন্তানের জনক। অপরদিকে বিবেকানন্দ ছিলেন প্রায় কপর্দকহীন এবং অকৃতদার। গৌতম বুদ্ধের মতবাদের সাথে সহমত না হলেও এবং কর্মক্ষেত্রের কার্যধারায় কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তাঁদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল প্রায় অভিন্ন। আর তা হলো মানবকল্যাণ। তাঁরা নিজস্ব যুক্তিপদ্ধতি, মৌলিক চিন্তা, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার প্রমাণপূর্বক নিজেদের আলোকিত করার পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছেন।

এমন অনন্য দুই মহামানবের সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, তবু বুদ্ধ ও স্বামীজীর চিত্র পর্যাবেক্ষণ মাত্রই আমাদের মধ্যে এক অভাবনীয় শক্তি সঞ্চারিত হয়, সকল প্রকার জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত হয়ে চিত্ত উন্নীত হয় দিব্যলোকে। আমাদের পার্থিব সত্তা যে প্রকৃত সত্তা নয়, আমরা যে 'অমৃতের পুত্র'– এই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হই, চিত্ত হয়ে ওঠে মুক্ত, শুদ্ধ, শান্ত-সমাহিত। বিবেকানন্দ ছিলেন যেমন কর্মে সুদৃঢ় ও অনমনীয়, তেমনই তাঁর হৃদয়ে স্রোতস্বিনীর মতো প্রবাহিত হতো দিব্যপ্রেমের ফল্গুধারা। বাল্যবস্থায় তিনি প্রায়ই তাঁর বন্ধুদের বলতেন যে, তিনি সন্যাসী হবেন। এমন উচ্চ ভাবনার আদর্শ বালক নরেন্দ্রের মধ্যে বীজাকারে সুপ্ত ছিল। তরুণ বয়সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রবল অনুরাগের কারণে ব্রাহ্মসমাজের মহির্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অনেক সাধক-মনীষীর সঙ্গে বিবেকানন্দের জীবনে সংযোগ ঘটে। ঈশ্বরদর্শন করেছেন এমন ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসার জন্য তাঁর মধ্যে দেখা দেয় তীব্র ব্যাকুলতা। তথাগত বুদ্ধের শৈলোপদেশের এক অপূর্ব বাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : 'বুদ্ধ, শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি; তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।' (বিবেকানন্দ, ২০০৫, পৃ. ৫২) অবশেষে স্বামীজীর জীবনে এলেন তৃষ্ণা নিবারণের অমৃতপাত্র নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরদর্শন করেছেন বলে ভক্তদের বিশ্বাস রয়েছে। ঈশ্বরব্যাকুল পথশ্রান্ত নরেন্দ্র পেলেন সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-স্পর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণও বাংলার ইতিহাসে আরেক রেনেসাঁ-মানব, যিনি 'যত মত তত পথ'– এর কথা হাজির করে

পৃথিবীকে শান্তির পথনির্দেশনা দিয়েছেন। কারণ যে যুগে বুদ্ধের জন্ম সে যুগে ভারতবর্ষে একজন মহান ধর্মাচার্যের প্রয়োজন হয়েছিল। পুরোহিতকুল ইতোমধ্যেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইহুদিদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বেশ বোঝা যায়, তাদের দুরকম ধর্মনেতা ছিলেন– পুরোহিত এবং ধর্মগুরু; পুরোহিতরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা-পদ্ধতিগুলো ছিল মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের অপকৌশলমাত্র। সমগ্র 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' (Old Testament)-এ দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারগুলোর বিরোধিতা করেছেন। আর এই বিরোধের পরিণতি হলো ধর্মগুরুদের জয় এবং পুরোহিতদের পতন।

তথাগত বুদ্ধ যে ইতিহাসের রেনেসাঁ-মানব তা বিবেকানন্দ নিজেও বুঝিয়ে দিয়েছেন। ১৮ মার্চ, ১৯০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে প্রদত্ত 'বুদ্ধের বাণী' শিরোনামের ভাষণে বিবেকানন্দ বলেন :

> তোমরা আর্নল্ড-এর 'এশিয়ার আলো' (The light of Asia, Edwin Arnold) কাব্যে পড়েছ : বুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং জগতের দুঃখ তাঁকে কত গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল; সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারে দ্বারে তিনি কতই ঘুরেছিলেন এবং অবশেষে করে বোধিলাভ করলেন। ... ভারতে পুরোহিত ও ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল, বুদ্ধ তার মূর্তিমান বিজয়রূপে দেখা দিলেন। .... ধর্মের এইসব বাড়াবাড়ির মূলোচ্ছেদ করলেন বুদ্ধ। তাঁর সমগ্র উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রী অন্যতম। মানুষ সকলেই সমান, বিশেষ অধিকার কারও নেই। বুদ্ধ ছিলেন সাম্যের আচার্য। পুরোহিত ও অপরাপর বর্ণের মধ্যে ভেদ তিনি দূর করেন। (বিবেকানন্দ, ২০০৫, পৃ. ৫২)

বুদ্ধ সম্পর্কে স্বামীজীর উপর্যুক্ত উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বুদ্ধকে অভেদ-দর্শনের উপস্থাপক হিসেবে হাজির করেছেন। সকল ভেদাভেদ দূর করে মানবমৈত্রীর অপূর্ব বাণী নিয়ে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। একইভাবে বিবেকানন্দকেও আমরা দেখি তিনি যে সময়ে ভূমিষ্ঠ হলেন তখন ভারতে চলছিল ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন (Young Bengal Movement) হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় যুবকরা ধর্মবিশ্বাস থেকে অনেকটা দূরে চলে যায়। ঈশ্বর সাকার নাকি নিরাকার এই তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই বিরোধ নিরসনে হাজির হলেন উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁ মানব শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শিক্ষিত বিবেকানন্দ

বিরোধ নিরসন করে বুঝিয়ে দিলেন ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার দুটি রূপই সত্য। তিনি প্রচার করলেন বেদান্ত– যার মূল কথা হলো প্রতিটি আত্মাই স্বর্গীয়। সহজ করে বললে সকলেই অনন্ত শক্তির আধার।

বিবেকানন্দের মনে গৌতম বুদ্ধের জন্য অতল শ্রদ্ধা। তাঁর বাণী ও রচনা (Complete works of Swami Vivekananda) পাঠ করলে দেখা যায় যে, দেশ-বিদেশে গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে এবং তাঁর ভাবাদর্শের প্রশস্তি করে তিনি মোট নয়টি ভাষণ দিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি ভাষণ দিয়ে জগৎবিখ্যাত হয়েছিলেন। সেখানে প্রদত্ত ইংরেজি ভাষণগুলোর মধ্যে একটি ভাষণের শিরোনাম ছিল 'Buddhism, the fulfillment of Hinduism'। এ ভাষণের সূচনায় স্বামীজী বলেছিলেন– I am not a Buddhist, as you have heard, and yet I am. If China or Japan, or Ceylon follow the teachings of the great Master, India worship him as God incarnate on earth'.(উদ্দীপন, ২০১৫, পৃ. ১৪৩)

সেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে দাঁড়িয়ে ধর্মমহাসম্মেলনে এই তরুণ সন্ন্যাসী বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা ছিল বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব। সেই ভাষণে তিনি আরও বলেন, Hinduism can not live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism. Then realise what the separation has shown to us, ... the wonderful humanisning power of the Great Master. (উদ্দীপন, ২০১৫, পৃ. ১৪৩) মহামতি বুদ্ধকে তিনি তাঁর প্রতিটি ভাষণে Great Master বলে সম্বোধন করেছেন। স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে তিনি বুদ্ধ ভাবাদর্শ ও মানবতাবাদকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিকাগোর ধর্মমহাসভা যখন সর্বধর্মের সমন্বয়ভূমি না হয়ে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তখন তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন 'সাইক্লোনিক' সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে 'জেন্টল' বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, অনাগরিক ধর্মপাল ও হেরাবির্তনে ধর্মপাল। শুধু সরবই হননি তাঁরা, অকাট্য যুক্তি এবং অবিসংবাদী সামর্থ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রাচ্যচিন্তা, দর্শন ও ধর্মের মহত্ব ও গৌরবকে। আধুনিক প্রাচ্যের পাশ্চাত্য-বিজয়ের সূচনা করেছিলেন তাঁরাই।

শুধু মানবতাবাদের ক্ষেত্রে নয় ধর্ম ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও বুদ্ধভাবাদর্শের মূর্ত প্রকাশ বিবেকানন্দের মধ্যে লক্ষ করা যায়। ধর্ম কী তা বলতে গিয়ে বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন, 'Relegion is a Journey from a Brute man to Buddha man।' অর্থাৎ ধর্ম হলো

মানুষকে পশু থেকে মানুষে এবং তারপর মানুষ থেকে বুদ্ধের ন্যায় দেবতায় রূপান্তরিত করা। ২২ অক্টোবর ১৮৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাল্টিমোরে দেওয়া 'বুদ্ধের ধর্ম' শীর্ষক ভাষণে বিবেকানন্দ বলেন :

> বৌদ্ধধর্ম একটি নূতন ধর্মরূপে স্থাপিত হয় নাই; বরং উহার উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে। মানুষের দুঃখকষ্টরূপ ভীষণ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহ এবং জীবনের সকল ভোগসুখ বিসর্জন দিয়াছিলেন। ... বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম। তবে অপর কোন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যাণশক্তি হারাইয়া ফেলে। (বিবেকানন্দ, ২০০৫, পৃ. পৃ. ৫৪-৫৫)

বৌদ্ধ ধর্ম প্রদর্শিত এই সম্প্রীতি ভাবটি লক্ষ করে একটি বিষয়ে সকল ধর্মের মানুষ একত্র হতে পারেন। সেটি হলো– নিজে ভালো হওয়া ও অন্যের কল্যাণ করা। ব্যাসদেবের বিখ্যাত কথা– 'পরোপকারায় পূন্যায়, পাপায় পরপীড়নম্'– অন্যের কল্যাণ করাই ধর্ম এবং অন্যকে দুঃখ দেওয়াই পাপ। সনাতন ধর্মে বিশ্বজনীন ধর্মের ভাবটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের কখনো মনে হয় যে, সম্প্রদায় জগতে না থাকাই উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'কিন্তু যতদিন পর্যন্ত মানুষ চিন্তা করিবে, ততদিন সম্প্রদায়ও থাকিবে।' এখন উপায় হলো, সম্প্রদায় থাকবে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থাকবে না। সম্প্রদায়গুলোর বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি বিরাজ করবে। কী করে সম্ভব? সেক্ষেত্রে নিজের আদর্শে নিষ্ঠা রেখেই অন্য আদর্শকে সম্মান জানানো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার অমোঘ উপায়। এজন্যই বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যদি পৃথিবীর একটি ধর্ম সত্য হয়, তবে সকল ধর্মই সত্য।'

বুদ্ধের যাপিত জীবন সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি শিক্ষাস্বরূপ। নিজের মধ্যে যে প্রবল আত্মশক্তি, তাঁর বোধ কীরূপে হতে পারে তা তিনি দেখিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ হতে বোঝা যায় যে, আত্মশক্তির জাগরণ হলো শিক্ষা, একইভাবে বিবেকানন্দও শিক্ষা নিয়ে যা বলেছেন তা বেশ বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী। তাঁর কথায়, "Education is the manifestation of perfection that is already in man"। (বিবেকানন্দ, ২০০৫, পৃ. পৃ. ৫৪-৫৫) অর্থাৎ মানুষের অন্তার্নিহিত সত্তার পূর্ণত্বের বিকাশই শিক্ষা। যে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান সে মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তার বিকাশ কীরূপে সম্ভব, মনুষ্যত্বের মানদণ্ডস্বরূপ, শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা বা

নীতি কী হওয়া উচিত– এ সকল বিষয়ে সবদেশে সবকালে বিভিন্ন অবতার পুরুষ, মনীষীবৃন্দ, চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারককে বারংবার আলোড়িত হতে দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে শিক্ষা সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের জীবনে কঠোর তপশ্চর্যা পরিলক্ষিত হয়। তিনি দীর্ঘ সময় ধ্যানে, মননে, চিন্তনে অতিবাহিত করেছিলেন– অনাহারে, অনিদ্রায়। তেমনিভাবে বিবেকানন্দকেও দেখি, তিনি কন্যাকুমারিকায় পাথর, জলোচ্ছ্বাস পেরিয়ে সাঁতার কেটে কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে গিয়ে ধ্যানস্থ হন। জগতের কল্যাণ কীরূপে হবে এবং দরিদ্র দেশবাসীর মুক্তি কীরূপে সম্ভব তা নিয়ে পথ অন্বেষণ করেন। উল্লেখ্য, ১৮৮৬ সালে বিবেকানন্দ তাঁর দুই সতীর্থকে নিয়ে বুদ্ধগয়া পরিভ্রমণে যান। সেই ভ্রমণেই মহামতি গৌতম বুদ্ধের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। মহামতি বুদ্ধের অহিংস বাণী, মৈত্রী, করুণা এবং সর্বজীবের প্রতি অখণ্ড ভালোবাসা ও প্রেম তাঁকে খুব বেশি করে উজ্জীবিত করে তোলে। সেই থেকেই তিনি বুদ্ধভক্ত হয়ে যান এবং তিনি বুদ্ধের শিক্ষাকে পরম পাথেয় মনে করেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজের জন্য গৃহত্যাগ করেননি, তিনি জীবজগতের কল্যাণ ও সকল মানুষের দুঃখমুক্তির জন্যই গৃহত্যাগ করেছেন। ১৯০০ সালে মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত শতাব্দীর শেষ ভাষণে তিনি বললেন :

> The life of Buddaha has an especial appeal. All my life I have been very fond of Buddha, but not of his doctrine. I have move veneration of that character than for any other- that boldness, that fearlessness, and that tremendous love! He was born for the good of man. ... He did not even care to know truth for himself. He sought truth because people were in misery. How to help them, ... the greatness of this man. (উদ্দীপন, ২০১৫, পৃ. ১৪৫)

বুদ্ধকে অনুসরণ করেই স্বামীজী জগতবাসীকে বললেন অভি! অভি! ভয় নেই। বললেন– উঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। স্বদেশে বিদেশে যখনই তিনি মানবকল্যাণের কথা বলতে গেছেন তখনই তাঁর মনে পড়েছে শ্রীগৌতম বুদ্ধের কথা। ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ সিস্টার নিবেদিতাকে দীক্ষা প্রদানের দিন তিনি বলেছিলেন, 'যাও বৎসে, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশবার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।'[১০] গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁর ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য সংঘমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই পথ অনুসরণ করে বিবেকাকন্দও প্রতিষ্ঠা করেন

জগৎবিখ্যাত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জেনারেল রিপোর্টে উল্লেখ আছে :

> Ramakrishna Math and Ramakrishana Mission are twin institutions which from the core of a worldwide spiritual movement which aims at the harmony of religions, harmony of the East and the West, harmony of the ancient and the modern, spiritual fullfillment, all round development of human faculties without any distinctions of creed, caste, race or nationality. (General Report, 2012, p. 1)

'জগতের সকল প্রাণী সুখি হউক'– বুদ্ধের এই করুণাবাণীই যেন বিবেকানন্দের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি ঘটে-পটে, প্রতিটি প্রাণীর প্রাণকোষে দর্শন করেছিলেন নিজেকে। অবোধ ছাগ-শিশুর প্রাণের বিনিময়ে, মহারাজ বিম্বিসারের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। আত্মবিসর্জনের এই উদাহরণ বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি।

বুদ্ধের জীবনকথা আর বুদ্ধ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে যেন সুধা বর্ষণ করত। তাই দেখা যায়, বিবেকানন্দ যখন বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের পূজা করে বুদ্ধের আশিষধারায় সিক্ত হয়ে ফিরে আসলেন, তখন বুদ্ধের গুণগান শুনতে চাইলেন স্বামীজীর মুখে। স্বামীজী আপ্লুত হয়ে গুরুকে শোনালেন বুদ্ধের জীবন-দর্শনের নিগূঢ়তত্ত্ব। বললেন, 'ঈশ্বর আছে কি নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাননি বুদ্ধ। তিনি শুধু দয়া দিয়েছিলেন। একটা বাজপাখি শিকার ধরে খেতে যাচ্ছিল, তাঁকে বাঁচাবার জন্য বুদ্ধ বাজপাখিকে তাঁর গায়ের মাংস কেটে দিয়েছিলেন। যাদের কিছু নেই, ঐশ্বর্য নেই, তারা কি ত্যাগ করবে।" (*অর্ঘ্য*, ১৯৭৭, পৃ. ২৩২)

স্বামীজীর কথায় ভাঁটা পড়ছিল, কিন্তু আরও শ্রবণের জন্য গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে জানতে চাইলেন– 'আর কী করলেন'?। স্বামীজী আবার বলতে লাগলেন– "তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধ এলেন কপিলাবস্তুতে। ... ছেলেকে, স্ত্রীকে, রাজবংশের অনেককে বললেন বৈরাগ্য নিতে, দেখুন, কি মহৎ চিত্তের রাজভাণ্ডার এনেছেন বুদ্ধ"। তিনি গুরুকে বুদ্ধের বজ্রকঠোর শপথের কথা অবগত করাতে গিয়ে বললেন, শক্তি ফক্তি কিছু মানতেন না বুদ্ধ। তাঁর শুধু নির্বাণ। গাছতলায় একাসনে তপস্যায় বসে বললেন– "ইহাসনে শুষ্যুতুমে

শরীরং"। যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বান লাভ করি ততক্ষণ শরীর শুকিয়ে কংকাল হয়ে যাক, উঠব না আসন ছেড়ে"। (*অর্ঘ্য*, ১৯৭৭, পৃ. ২৩২) বুদ্ধের এ বজ্রকঠোর শপথের মন্ত্রই বিবেকানন্দের প্রাণকে সতেজ করেছিল– প্রেরণা যুগিয়েছিল কৃচ্ছ সাধনায় ব্রতী হতে। স্বামীজী বুদ্ধের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তা তাঁর মুখের ভাষাতেই সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে :

> বুদ্ধের অনুগামীরা খুব উদ্যামী ও প্রচারশীল ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম নিজ ধর্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বতে তাঁরা প্রবেশ করেছেন; পারস্য, এশিয়া-মাইনরে তাঁরা গিয়েছিলেন: রুশ, পোল্যান্ড এবং এমন আরও অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গেছেন। চীন, কোরিয়া, জাপানে, তাঁরা গিয়েছিলেন; ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। (উদ্দীপন, ২০১৫, পৃ. ১৪৫)

বুদ্ধের অনুগামীদের মতো স্বামীজীও বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে গেছেন। তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষ হতে পশ্চিমে যান, তখন নদীপথে যাত্রা করতে হতো। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবাসী তখন নদী পার হয়ে বিদেশযাত্রা ধর্মবিরুদ্ধ বলে মনে করত। এ প্রথা ভেঙে স্বামীজী পশ্চিমে যাত্রা করেন এবং সেখানে ভাষণ প্রদান করে তিনি পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করলেন। ওয়াশিংটনের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রশস্তি করে প্রতিবেদন বের হয়। বলা প্রয়োজন তিনি কিন্তু পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম প্রচার করতে যাননি, তিনি গিয়েছিলেন বিশ্বজনীন মানবতাবাদ প্রচার করতে। আর তা করতে গিয়ে বহু স্থানেই তিনি গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর ভাবাদর্শের কথা উদ্ধৃত করেছেন। স্বামীজী পশ্চিমদেশীয় শ্রোতাদের বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, 'তাঁর (বুদ্ধের) বাণী ছিল এই : আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদেরই জন্য সবকিছু বাসনা করি– তাই তো এত দুঃখ।' (বিবেকানন্দ, ২০০৫, পৃ. ৮) বুদ্ধের কাছ থেকে নিঃস্বার্থপরতার শিক্ষাটি আমরা সাদরে গ্রহণ করতে পারি। এই নিঃস্বার্থ হওয়াটাই সবচেয়ে বড় শেখার জিনিস, সামাজিক জীব হিসেবে আমরা যদি মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে চাই, নৈতিকতাকে আমরা যদি কোনো মর্যাদা দিতে চাই, তাহলে আমাদের নীতিপরায়ণ হতে হবে। বিশ্বখ্যাত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ মূল্যবোধের একটা অর্থ ও সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে বুদ্ধের পথ অনুসরণ করে বলেছেন, "মূল্যবোধ গুণ তাকেই বলা হবে যেটা নিঃস্বার্থ, আর যেটার মধ্যে স্বার্থই সব, সেটাই হচ্ছে মূল্যবোধহীনতা বা নীতিহীনতা"। (হোসেন ও দেব, ২০২০, পৃ. ৮৩) এই সংজ্ঞার্থটিকে যদি একটু পরীক্ষা করে দেখি, আমরা দেখব যে, এটা বহুকাল আগের সত্য

ছিল, আজও সত্য আছে, ভবিষ্যতেও সত্য থাকতেই হবে। এটাই হচ্ছে সর্বজনীন মূল্যবোধ বা নীতির মান।

বুদ্ধের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেন প্রতিমূহূর্তে প্লাবিত হচ্ছে তাঁর করুণাধারা– অতি দুর্গত মানুষের প্রতি। বর্তমান যুগের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ স্বামীজীকে মানবদরদিরূপে যখন দেখি, তখন তিনি অসামান্য, প্রকৃত অর্থে তিনি বুদ্ধ ভাবাদর্শের অনুসরণকারী। স্বামীজীর আত্মত্যাগী ভাবাদর্শ বিশ্লেষণ করলে তা অসংখ্য গ্রন্থে রূপায়িত হবে। কেবল একটি দুটি উক্তিই উদ্দীপ্ত করে জনচেতনাকে; 'আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি– সব ত্যাগ। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালে কল্যাণ করা– এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে। ... আমি একমাত্র কর্ম বুঝি– পরোপকার, বাকি সর্ব কুকর্ম। (উদ্বোধন, ২০১৩, পৃ. ১৩৯) অসাধারণ তাঁর এই উক্তি। ইতিহাসে তাই বিবেকানন্দকে শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। মাত্র ৩৯ বছরের জীবনকাল তাঁর। কিন্তু এর মধ্যে নিরন্তর কাজ করে গেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করে তিনি অন্নদান, শিক্ষাদানসহ নানা সেবাকাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় ২৭৪টি শাখা কাজ করছে বাংলাদেশসহ নানা দেশে। আর প্রায় ১৭০০ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী পৃথিবীজুড়ে সেবাকাজে যুক্ত থেকে মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে পাঞ্জেরীস্বরূপ। বিবেকানন্দ এই সংগঠনের 'Motto' নির্ধারণ করেছেন– 'আত্মানো মোক্ষর্তাং জগদ্বিতায় চ।' অর্থাৎ, নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ।

প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী বুদ্ধের মৈত্রী ভাবাদর্শের মর্মোপলব্ধি করে জীবনে তা প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই দেখা যায় তিনি সংস্কারমুক্ত হয়ে সর্বজীবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। বেলুড় মঠে তিনি একবার পরিচ্ছন্নতাকর্মী কিছু সাঁওতাল মানুষকে আহার করানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করে তা সম্পাদনও করেন এবং তারপর বলেন আজ আমার নরনারায়ণ সেবা হলো। সাধারণ মানুষকে খাইয়েছেন তিনি, তারপর তাঁদের সেবাকে ঈশ্বরসেবা বলে অভিহিত করেছেন। আর মানুষকে ঈশ্বর বলে দেখার শিক্ষাটি তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। যিনি বলতেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অর্থাৎ জীবকে সেবা মানেই ঈশ্বরের সেবা। বুদ্ধের মৈত্রী ভাবাদর্শ আর রামকৃষ্ণের সেবাদর্শের মূর্তিমান প্রকাশ হয়ে এলেন বিবেকানন্দ। তাই বিবেকানন্দের মুখে আমরা পেলাম মানবসেবার সেই অপূর্ব অনুসিদ্ধান্ত :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

তাই আমরা দেখি ১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে যখন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে তখন স্বামীজী লিফলেট প্রচার করে মানুষকে সেবার জন্য আহ্বান জানান এবং বিপদের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাঁদের পাশে থেকে সেবাপ্রদান করবেন বলে নিশ্চিত করেন। বর্তমানেও সেই ধারা অব্যাহত রেখে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা স্বাস্থ্যসেবাদান করে চলেছেন। সংস্কারমুক্ত স্বামীজী সম্পূর্ণভাবে ভাবাদর্শের ওপর আস্থাবান ছিলেন। "দেবতার সামনে ঘণ্টানাড়া, পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো, তাঁহার পূজরাগাদি অনুষ্ঠান ধর্ম নয়। হিন্দুধর্মে আরেকটি বিগ্রহ যোগ করিবার জন্য তিনি আসেন নাই। ওগুলোকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে তাঁর ভাব ছ'ড়া।" (প্রভানন্দ, ২০০১, পৃ. ১৪৯) এমনই স্পষ্টভাষী ছিলেন স্বামীজী। শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যই বলতেন, "আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নেই, বাজিয়ে দেখ টং টং করছে।"(প্রভানন্দ, ২০০১, পৃ. ১৪৯) অতএব বুঝতে পারা যায় বিবেকানন্দ একটি জ্ঞানসূর্য। তিনি একটি বিশাল অগ্নির সম্ভার। এক একটি শিখায় যেন তিনি ভস্ম করছেন মানুষের অজ্ঞানতাকে।

আত্মশুদ্ধি আর আত্মনির্ভরতার মধ্যে নিহিত আছে মুক্তির চাবিকাঠি। বুদ্ধের এ বাণীকে চলার পথের পাথেয় করে বিবেকানন্দ দৈবশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন না করে জগতের রূঢ়বাস্তবতার মধ্যেই আপন লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি কলম্বোর বুদ্ধ-মন্দিরে সৌম্য শান্ত বুদ্ধমূর্তি দেখে বলেছিলেন– মানুষকেই বড় করেছেন বুদ্ধ, মানুষের মুখকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন দেবতার দিক থেকে। ফিরিয়ে দিয়েছেন নিজের দিকে– আত্মশক্তির দিকে। মানুষ হীন নয়, দৈবাধীন নয়, মানুষ তার উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে মহীয়ান।" (*অর্ঘ্য*, ১৯৭৭, পৃ. ২৩৪) এর প্রতিফলন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনায়নে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীতে সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছিলেন মানবদরদি বুদ্ধ।তাই মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতির মন্ত্রদাতা বুদ্ধের সাম্যবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল বিবেকানন্দের অন্তরমূলে। তাই তিনি ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতার মূলে পদাঘাত করে মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিরন্ন-দরিদ্র-চণ্ডাল দেশবাসীকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন। পাশাপাশি ভাষার আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা বুদ্ধের জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, "আমি গরীবদের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য আমাকে জনগণের ভাষায় কথা বলতে দাও।" (অর্ঘ্য, ১৯৭৭, পৃ. ২৩৪) প্রান্তিক তথা নিম্নবর্গের মানুষ আর মানুষের মুখের ভাষার প্রতি এ স্বীকৃতি– বুদ্ধের ভাবাদর্শের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ইঙ্গিতই বহন করে।

বাংলার কবি, যিনি বিশ্বকবি হিসেবে পরিচিত, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা তুলনাহীন। কবিগুরু তাঁর গদ্যরচনা ও হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে মহাকারুনিক বুদ্ধের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। তিনি বলেন, 'মানবেতিহাসে তাঁর (বুদ্ধের) চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রিম করে ব্যাপ্ত হলো দেশ-দেশান্তরে। ভারতবর্ষ সেদিন তীর্থ হয়ে উঠলো, স্বীকৃত হলো সকল দেশের। কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন হিসেবে। তিনি কখনো কাউকে অবজ্ঞা করেননি, এজন্য তিনি আর গোপন রইলেন না।" (উদ্দীপন, ২০১৫, পৃ. ১৪৬) কবিগুরু এইভাবে বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক রোমা রোঁলা ভারতবর্ষকে কীভাবে জানা সম্ভব, এ প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে পড়ো, তাঁর মধ্যে সবই ইতিবাচক, কোনকিছু নেতিবাচক নেই।' পরবর্তী সময়ে রোমা রোঁলা বিবেকানন্দকে খুব মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর প্রতি এতোটাই অনুরক্ত হন যে, *The Life of Swami Vivekananda* নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

সাম্যবাদের পূজারি বিবেকানন্দ বুদ্ধের সংঘশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে গঠন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। "এই মিশন একটি আধ্যাত্মিক ভাবান্দোলন, এর শিকড় ঔপনিষদিক ঐতিহ্যে প্রোথিত, অবশ্য এর সংগঠন ও কার্যপদ্ধতির মধ্যে কেউ কেউ বৌদ্ধসংঘের এবং পাশ্চাত্যের সমাজের সাংগঠনিক কলাকৌশলের প্রচ্ছায়া দেখতে পেয়েছেন"। (প্রভানন্দ, ২০০১, পৃ. ১৫২) বরানগর মঠের "তাপসগন *ললিতবিস্তর*, *ঈশানুসরণ*, *গীতা* প্রভৃতি গ্রন্থ তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন।" (প্রভানন্দ, ২০০১, পৃ. ১৫৩) *ললিতবিস্তর* মূলত বুদ্ধের জীবনী ও বাণী– *ঈশানুসরণ* খ্রিস্টভাবাদর্শ-ভিত্তিক ও *গীতা* হিন্দুধর্মের সারগর্ভ। উদারচেতা স্বামীজী কী অপূর্ব ত্রিবেনীসঙ্গম ঘটিয়েছেন।

বহু ঘটনার মধ্যে স্বামীজীর প্রতিটি মানুষের প্রতি দরদভরা প্রাণের প্রতিফলন খুঁজে পাই। এমনই একটি ঘটনা : বিবেকানন্দের ঢাকা সফরের (১৯০১ সাল) সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎলাভের জন্য এক বাঈজি এসে উপস্থিত হলে অন্যরা সেই বাঈজিকে বাঁধা দিতে উদ্যত হয়। স্বামীজীর কানে একথা পৌঁছামাত্র তিনি তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেন। বাঈজীকে মা সম্বোধন করে তাঁর কথা শুনেন এবং কিছু কথা বলেন। এতে বাঈজির মন শান্ত হয় এবং তিনি প্রশান্তি লাভ করেন। পাশাপাশি প্রতিটি ধর্মের প্রতিও ছিল তাঁর অতল শ্রদ্ধা। সনাতন ধর্মাবলম্বী হয়েও তিনি বলেছেন, বুদ্ধ আমার ইষ্ট দেবতা। বুদ্ধ যদি সাম্যাচার্য হন,

বিবেকানন্দ সমন্বয়াচার্য। তাঁকে সর্বধর্ম সমন্বয়কারী বলা হয়ে থাকে। সর্বধর্ম মানে সব ধর্মকে এক জায়গায় করা নয়। যে যার ধর্মের নিষ্ঠা, যে যার ধর্মের গভীরতা নিয়ে থাকবে। কারোরই ধর্মান্তকরণের দরকার নেই। পরম সৃষ্টিকর্তার ভক্ত হবার দরকার আছে। (উদ্দীপন, ২০০৭, পৃ. ৮৭) বেদ বলেছে– 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সর্বত্রই ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নেই। সেজন্য কাউকে ঘৃণা করা বা কারও প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখানো পরম ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ব্যাপার। অসহিষ্ণুতা কোনো ধর্মের বিষয় নয়। পবিত্র কোরআন শরীফেও আছে 'সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জাতি', বাইবেল বলেছে– প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালবাস'। বুদ্ধ বলেছেন, 'ভালবাসা ঘৃণাকে জয় করতে পারে'। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষের বাণী আমাদের সর্বজনীন মৈত্রীরই শিক্ষা দেয়।

১৮৯৬ সালে লন্ডনে প্রদত্ত 'The absolute and manifestation' বিষয়ে বক্তৃতায় স্বামীজী উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর দৃষ্টিতে বুদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধদেবই প্রথম অদ্বৈতত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। বুদ্ধদেব সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন। "It was the great Buddah, who never cared for the dualist gods, and who has been called an atheist and materialist, who yet was ready to give up his body for a poor goat, ... wherevere there is a moral code, it is a ray of light from that man" (srishtisandhan.com) তিনি বুদ্ধকে মহামানব বলে জেনেছেন, কোনো দেবতা হিসেবে নয়। দেখেছেন দুঃখমুক্তির একজন ত্রাতা হিসেবেও। তাই তিনিও বুদ্ধের মতো বলেছেন মুক্তির জন্য আত্মপ্রচেষ্টাই যথেষ্ট, তৃতীয় কোনো অদৃশ্য শক্তির প্রয়োজন নেই। প্রতিটি জীবের মধ্যেই শিবের অবস্থান। শিব কোনো আলাদা সত্তা নয়। জীবপ্রেমই শিবপ্রেম। শুধু এ শিবপ্রাপ্তির বন্দনায় প্রয়োজন কামনা-বাসনামুক্ত সৎচিন্তার, পরমজ্ঞান সত্য উপলব্ধির।

বুদ্ধ ভাবাদর্শের মূর্ত প্রকাশ স্বামীজীর কথাগুলো আমরা স্মরণ করতে পারি, যেখানে পরমত সহিষ্ণুতা শুধু নয়, পরমতকে নিজের মতের ন্যায় শ্রদ্ধা জানানোর কথা আছে। তিনি বিশ্বজনীন উদারতার কথা বলেছেন : আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাবো, খ্রীষ্টানদিগের গীর্জায় প্রবশ করিয়া বুদ্ধের ও তাঁহার স্মরণ লইবো, এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেইসব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইবো, যাঁহারা সকলে হৃদয়কন্দর উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট। (ধ্রুবেশানন্দ, সাক্ষাৎকার, ২০২২)

পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধের জীবন ও বাণীকে এ যুগে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বুদ্ধাবতার বিবেকানন্দ। একমাত্র বিবেকানন্দকে দেখেই বুদ্ধের হৃদয়ের মহাকরুণার ধারণা করা সম্ভব। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, জ্ঞানে, প্রচারে স্বামীজী বুদ্ধ ভাবাদর্শের সার্থক প্রকাশ। *গুণব্যুহ* গ্রন্থে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন– স্বামীজীর অন্তরেও যেন সে ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। মঞ্জুশ্রী বলেন, I do not wish to become a Buddha quickly, because I wish to remain to the last in this world to save its beings.

সহায়কপঞ্জি :

অমৃতত্বানন্দ। (১৯৮১)। *বিবেকানন্দ চরিত*। দিনাজপুর : দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন। পৃ. ২।

অর্ঘ্য। (১৯৭৭)। *সুবর্ণজয়ন্তী-স্মারক গ্রন্থ*। বাগেরহাট, রামকৃষ্ণ আশ্রম। পৃ. ২৩২।

উদ্দীপন। (২০১৫)। *স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ-শততম জন্মজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ*। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা। পৃ. ১৪৩।

উদ্বোধন, স্বামীজী। (২০১৩)। *সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা*। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ১৩৯।

প্রভানন্দ, স্বামী। (২০০১)। *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা*। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ৪৯।

বিবেকানন্দ, স্বামী । (২০০৫)। *ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী*। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ৫২।

বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১৪)। *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*। কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। পৃ. ১।

সাক্ষাৎকার, স্বামী ধ্রুবেশানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ কুঠীর, আলমোড়া, উত্তরাখন্ড, ১৫ জুলাই ২০২২।

আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ ও মিলটন, কুমার দেব। (২০২০) *রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ*। গ্রন্থকুটির, ঢাকা। পৃ. ৮৩।

https://www.srishtisandhan.com

The General Report of Ramakrishna math & Ramakrishna Mission, West Bengal, India. 2012. p.1